পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ- কীভাবে ASER ২০২১–এর তথ্যাবলি আমাদের আগামী পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে -

রুক্মিণী ব্যানার্জী

ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ASER – Annual Status of Education Report বিগত ১৫ বছর ধরে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সমগ্র গ্রামীণ ভারতব্যাপী এটি একমাত্র বার্ষিক তথ্যাবলির উৎস যা শিশুদের বুনিয়াদি শিক্ষার ফলাফল নমুনাভিত্তিক ভাবে প্রকাশ করে থাকে। সাধারণত ASER হল গ্রাম তথা পরিবারভিত্তিক একটি সমীক্ষা যা প্রতিটি জেলায় সংঘটিত করা হয়। শিশুদের নাম নথিভুক্তকরণ এবং স্কুলের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা ছাড়াও এখানে শিশুদের সরল পাঠ দেওয়া হয় রিডিং পড়ার জন্য আর গাণিতিক সমস্যা দেওয়া হয় সমাধান করার জন্য। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই সময় বেছে নেওয়ার কারণ - যাতে বর্তমান বছরে শিশুদের বিদ্যালয় সংক্রান্ত পড়াশোনা এবং শেখার স্তর জানা ও বোঝা যায়। এটি শুধুমাত্র শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার আগে করার জন্য নয়, পরবর্তী বছরের সরকারি বাজেট ও পরিকল্পনায় সহায়তা করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

অন্যান্য যাবতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপের মতো অতিমারী ASER-এর এই কর্মধারাকেও বিঘ্নিত করেছে। ২০২০ সালে স্বাভাবিক ASER মূল্যায়ন করা যায়নি। ২০২১ সালের কোভিড-এর প্রকোপটি অন্যরকম। কর্ণাটক (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২১), ছত্তিসগড় (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১) এবং পশ্চিমবঙ্গ (ডিসেম্বর২০২১) এই তিনটি রাজ্যে ASER সমীক্ষা চালানো হয়েছিল।পশ্চিমবঙ্গের ASER ২০২১-এর প্রতিবেদনটি হল বিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিশুদের শিখন সংক্রান্ত মূল্যায়নের সাম্প্রতিকতম তথ্যাবলি। যা অতীতে সংগৃহীত তথ্যাবলির সঙ্গে তুলনা করা সম্ভবপর।দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকা, সর্বব্যাপী সংক্রমণ, অসুস্থতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা বিভিন্ন পরিবার এবং সমুদায়কে কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। শিশুদের জন্য যে দুটি বিষয় গভীর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে তা হল – স্কুলে ফেরত না আসা এবং গুরুতর শিখন ক্ষতি।

পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে কিছু প্রত্যাশিত এবং কিছু অপ্রত্যাশিত তথ্য পাওয়া গেছে।পশ্চিমবঙ্গে সবসময়ই সরকারি স্কুলে ভর্তির হার বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই দুঃসময়েও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ২০১৮ সালে ৮৮.১ % ছিল, ২০২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৫ % হয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে বহু পরিবার গ্রামীণ বেসরকারি স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে না পারার জন্য সরকারি স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে, যা সমগ্র ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই দেখা গেছে।

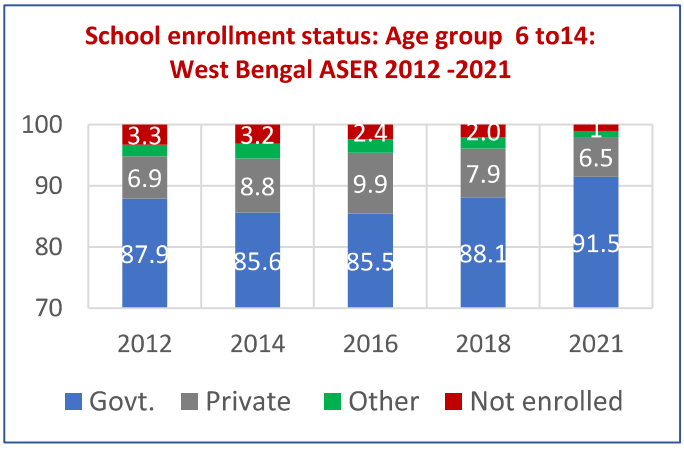

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গত বছরের তুলনায় স্কুলে ভর্তি না হওয়ার অনুপাত কমেছে। সর্বসাধারণের ধারণা এবং বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা হল শিশুরা, মূলত বয়ঃসন্ধির মেয়েরা, স্কুলে ফেরত আসার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে, যা গভীর চিন্তার কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের নাম নথিভুক্তকরণের ASER ২০২১ যে তথ্যাবলি গ্রাম থেকে তুলে এনেছে তাতে কিন্তু 'মেয়েদের স্কুল ছুটের' সম্ভাব্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকৃত তথ্যটি তখনই আমাদের সামনে

আসবে যখন স্কুল খুলবে আর নিয়মিত ভাবে ক্লাস চলবে। সেই সময় স্কুলে ভর্তি এবং স্কুলে উপস্থিতি তুলনা করে দেখলে বাস্তব চিত্রটি পাওয়া যাবে। প্রতিদিনের উপস্থিতি তখনই স্থিতিশীল হবে যখন প্রতিটি শিশু নিয়মিত স্কুলে আসবে।

'শিখন ক্ষতি' নিয়ে কী হবে ? সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে সবচাইতে বেশি সময়কাল ধরে স্কুল বন্ধ থেকেছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হল অন্যতম একটি রাজ্য যেখানে সবচাইতে বেশি সময় স্কুল বন্ধ থেকেছে। সাধারণভাবে সকলে বিশ্বাস করেন যে, স্কুলে না যেতে পারার জন্য শিশুরা শেখার সুযোগ পায়নি। বিশেষত খুব অল্প বয়সী শিশুদের স্কুল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি দক্ষতা শেখায়; যা হল সামাজিক দক্ষতা এবং একে অপরের সাথে মেলামেশা করার দক্ষতা। শিক্ষাগত দিক থেকে দেখলে শিশুরা যা শিখেছিল তা শুধু ভুলে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে তারা নতুন জিনিস শেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমানে শিশুর শিখন মূল্যায়ন ও তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আমরা আগামী দিনের পরিকল্পনার বাস্তবানুগ প্রয়োগ ঘটাতে পারি।

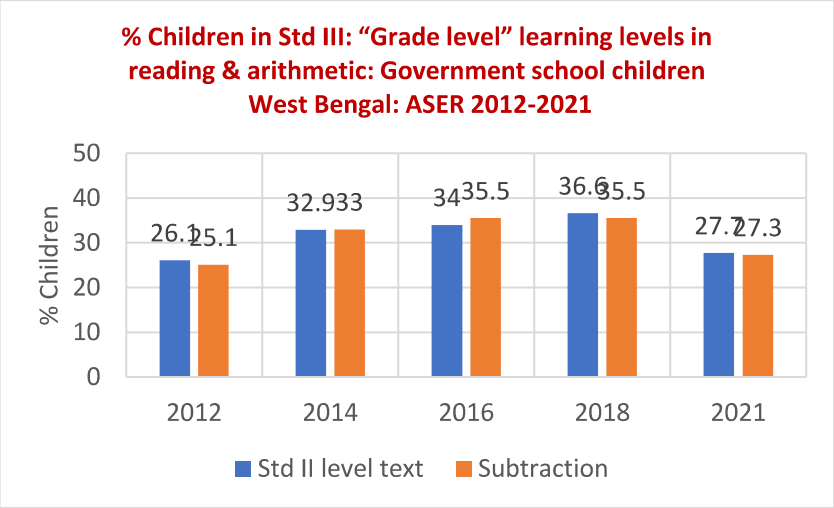

শিখন এবং ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শ্রেণির শিখন স্তর দেখে নিই।

তিনটি বিষয় এখানে লক্ষ্যনীয়ঃ প্রথমত শিখন স্তর (বুনিয়াদি পঠন এবং গণিত) আশাব্যাঞ্জক নয়। এমনকি প্রাক্ কোভিড সময়েও তা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে যারা সরকারি স্কুলে পড়ে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ শিশু তাদের 'শ্রেণি স্তর'-এ রয়েছে। ASER-এ শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণির সমতুল্য পাঠ নিয়ে এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল। গণিতের ক্ষেত্রে এটি দেখার উদ্দেশ্য ছিল যে শিশুটি অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির শিখন স্তরে রয়েছে কিনা। শিশুদের ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে এবং দুই অঙ্কের হাতে রাখার বিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা চিত্রটি মোটামুটি সমস্ত ভারতের অবস্থার সমান। তাই সময়কাল ধরে এই প্রবণতা দেখা যায় যে, সমস্ত ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শিশুকে প্রথন দুই বছর স্কুলে পড়াশনা ছাড়াই 'ছেড়ে দেওয়া' হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'শ্রেণি স্তরে' থাকা শিশুর অনুপাত ২০১২ থেকে ১০১৮ সালে ধীরে ধীরে কিছুটা বেড়েছে।

তৃতীয়ত, অতিমারীর সময় তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মৌলিক শিখনের চিত্রটি নিম্নগামী। সরকারি স্কুলে পঠনরত দ্বিতীয় শ্রেণির 'গল্প' স্তরের শিশুর সংখ্যা ২০১৮ সালে যা ছিল ৩৬.৬% তা হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে হয়েছে ২৭.৭ %। গণিতের ক্ষেত্রেও এই সময়কালে শিশুর শিখনে একটি সুনিশ্চিত নিম্নগতি দেখা গেছে। প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রেও শিখনের এই নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়।

শিশুদের এই শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার করার জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে; যা আমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।এই বিষয় দুটি পুনরায় স্কুল চালু হওয়া এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, একেবারে ছোটো ছেলেমেয়েরা যারা ১ম এবং ২য় শ্রেণিতে যাচ্ছে তাদের প্রাক্ প্রাথমিক (অঙ্গনওয়াড়ি) শিক্ষার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তারা বস্তুত সরাসরি পরিবারে কোল থেকে সোজা বিদ্যালয়ে আসে। তাদের পক্ষে বর্তমান পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন আর তার জন্য তারা এখনও উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের বেশ কয়েকমাস 'ওয়ার্ম আপ' প্রয়োজন। স্কুলে আসা আর শেখার জন্য, প্রস্তুত করার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় ও সাহায্য করা দরকার। সরাসরি তাদের শ্রেণি সংক্রান্ত নির্দেশনার মধ্যে না আনাই উচিত। কারণ তাহলে কেবলমাত্র আজ নয়, আগামী দিনেও তাদের শিক্ষা যাত্রাপথে তারা অসুবিধার সম্মুখিন হবে।

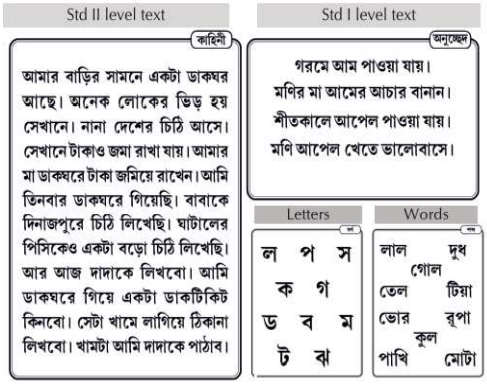

দ্বিতীয়ত, একটু বড়ো শিশু যারা তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে তাদের অবস্থা ২০২১ -এর ASER তথ্যে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে।

ASER-এর রিডিং-এর কাজ এখানে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি নমুনা(sample) অনুযায়ী নির্বাচিত শিশুকে একক ভাবে পড়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। একবার শিশুটি সাবলীল ভাবে পড়তে পারলে তাকে উচ্চতর স্তরে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির সমস্ত শিশুকে একই পড়ার কাজ দেওয়া হয়েছিল।

২০০৫ সালে প্রথম ASER সমীক্ষা করার সময় থেকে মূল্যায়নের একই পদ্ধতি চলে আসছে। সুতরাং ASER-এর তথ্যাবলির সাহায্যে ১৫ বছরের বেশি সময়কাল ধরে বিষয়টি তুলনা করা যায়।

নীচের টেবিলটিতে ২০২১ সালে ASER সংগৃহীত তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শ্রেণিতে রিডিং পড়ার বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

Std	Not able to recognise letters yet	Can recognise letters but not read words	Can read simple words but not sentences	Can read basic paragraph at Std I level but not higher	Can read "story" at Std II level and maybe also a higher-level text	**Total**
III	12.6	20.7	17.5	19.8	29.5	100
IV	8.0	14.0	17.5	21.3	39.2	100
V	6.5	10.6	16.1	18.4	48.5	100

প্রতিটি সারি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রতিটি শ্রেণির রিডিং পড়ার দক্ষতায় তারতম্য রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির তথ্যে দেখা যায় যে ৩০ % শিশু 'শ্রেণি স্তর'-এ রয়েছে। এমনকি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অর্ধেকেরও কম শিশু 'মৌলিক' স্তরের (দ্বিতীয় শ্রেণির) পাঠ পড়তে পেরেছে। পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ১৭ % শিশু 'বর্ণ' স্তরের নীচে রয়েছে। ১৬ % শিশু শব্দ পড়তে পারে আর ১৮ % শিশু কেবলমাত্র বাক্য পড়তে পারে, বড়ো গল্প নয়। সুতরাং এই শিশুদের তাদের শ্রেণি স্তরে পড়ালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা তাদের সাহায্য করবে না। পঞ্চম শ্রেণির ৫০ % শিশুই তাদের পাঠ্যপুস্তক নির্ভর শ্রেণির স্তর ভিত্তিক শিক্ষণে লাভবান হবে না। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০ % শিশুই শ্রেণি স্তর সংক্রান্ত শিক্ষণ নির্দেশনার স্তরে নেই। শ্রেণি স্তর ভিত্তিক শিক্ষণ অথবা 'যথাপূর্বং' শিক্ষণ এই শিশুদের 'শিখন সংকটের' অন্যতম প্রধান কারণ, যা প্রাক্ কোভিড কালেও ছিল।

এই সমস্যার একটি সমাধান হল, শিশুরা বর্তমানে যে স্তরে রয়েছে সেখান থেকেই শেখাতে শুরু করা। এরপর তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সক্ষম করে তোলা, দক্ষতা বাড়ানো। এই পদ্ধতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ' Teaching – at the – Right – Level ' বলা হয়ে থাকে (TaRL)। যা নিম্নগতির শিখন সমস্যা সমাধান করার জন্য 'প্রথম' ব্যবহৃত একটি ফলপ্রসূ এবং স্থায়ী পদ্ধতি। এটি নোবেল পদক বিজয়ী অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক এস্থার দুফলো কর্তৃক Povery Action Lab of MIT দ্বারা পরীক্ষিত। তাঁরা এই পদ্ধতিটিকে অল্প সময়ের মধ্যে শিশুর বুনিয়াদি শিখন দক্ষতা বিকাশের জন্য ফলপ্রসূ বলে সুনিশ্চিত করেছেন।

শিশুদের তাদের শিখন স্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদা দল গঠন করে এই কাজ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদি তিনজন শিক্ষককে এই ক্লাসের জন্য পাওয়া যায়, একজন শিক্ষক এই সমস্ত শিশুদের মধ্যে যারা বর্ণ চিনতে পারে না তাদের নিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু শব্দ নিয়ে নয়। দ্বিতীয় শিক্ষক সেই শিশুদের নিয়ে কাজ করবেন যারা শুধুমাত্র শব্দ পড়তে পারে, কিন্তু বাক্য নয়। তৃতীয় শিক্ষক, যে শিশুরা 'রিডার' শুধুমাত্র তাদের নিয়ে কাজ করবেন। এখানে দেওয়া টেবিলটি উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা যায়। Teaching at the Right Level-এ দলগত ভাবে শিশুদের তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পড়ানো প্রয়োজন, তাদের শ্রেণি অনুযায়ী নয়। সঠিকভাবে শিশুদের দল তৈরি করা, সঠিক নির্দেশনাদান এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি প্রতিদিন এক ঘন্টা করে রিডিং পড়ার দক্ষতা নির্মাণ এবং অপর এক ঘন্টা মৌলিক গণিত নিয়ে কাজ করলে শিশুদের অগ্রগতি দ্রুততর হয়।

অতিমারী এবং তার ফলাফলের ওপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের এখন সামনে তাকাতে হবে আর কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের সক্ষমতার অর্ন্তগত। স্কুল পুনরায় খোলা এবং তারও আগে এই কাজ করতে হবে যাতে শিশুদের আগামী দিনে শিক্ষার গতিপথ উজ্জ্বল হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আশু লক্ষ্যমাত্রা আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। এটি জরুরি ভিত্তিতে একনিষ্ঠ ভাবে কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন। কম বয়সী শিশু, যারা 'শেখা এবং স্কুলে আসার জন্য প্রস্তুত' তাদেরকে স্কুলে আনা। আর একটু বড়ো শিশুদের জন্য 'ক্যাচ আপ' করা। আজ ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়কেই সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রুক্মিণী ব্যানার্জী, সি ই ও প্রথম এডুকেশন ফাউন্ডেশন